৯৯ শতাংশ বনাম ১ শতাংশ

আইসিটির দায়

আবীর হাসান

ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত প্রকাশ্যেই এসে পড়ল এবং বেশ সমারোহেই। 'নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার' নামের সামরিক-রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসাধনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার সাত মিত্র যখন বিশ্বের উন্নয়নশীল এবং স্বল্পোন্নত দেশগুলোকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলার আয়োজন করছে, তখন খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক রাজধানী নিউইয়র্কের অধিবাসীরা সেপ্টেম্বরের (২০১১) তৃতীয় সপ্তাহ থেকে এমন এক আন্দোলন শুরু করলেন, যা পুঁজিবাদের ভীত ধরেই যেনো টান মেরে বসল।

এখন অনেকেই সম্ভবত বিষয়টি সম্পর্কে জেনে গেছেন, না জানার কথাও নয়। কারণ, আইসিটির সুবাদে সবকিছুই খোলাসা হয়েছে। মার্কিন সরকার শত শত মানুষকে গ্রেফতার করেও একবিংশ শতকের অভিনব পুঁজিবাদবিরোধী আন্দোলনকে দমাতে পারেনি। বরং গ্রেফতার আর পুলিশি অ্যাকশন ঘৃতাহুতি দিয়েছে আন্দোলনে। হ্যাঁ ফেসবুক, টুইটার আর ব্লগ দিয়েই ছড়ানো হয়েছে বিপ্লবের বার্তা। 'অকুপাই ওয়াল স্ট্রিট'-এর আন্দোলনকারীরা বিশ্ববাসীকে ডাক দিয়েছেন এই বলে যে-'তৈরি হও অক্টোবর বিপ্লবের জন্য।' হ্যাঁ নিউইয়র্কের জুকোটি পার্কে অবস্থান নেয়া ওয়াল স্ট্রিটবিরোধী আন্দোলনকারীরা সেই ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু করে অক্টোবর মাসজুড়েই তাঁবু খাটিয়ে রাতযাপন করছেন পার্কে। প্রথমদিকে ধরপাকড় চালালেও আন্দোলন দমেনি। আইসিটির মাধ্যমে ছড়িয়ে দেয়া বার্তায় আন্দোলনকারীরা বিশ্বের ৫৮টি দেশে পুঁজিবাদবিরোধীদের সংগঠিত করতে সমর্থ হয়েছে। আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্তত ২২টি শহরে ছড়িয়ে পড়েছে আন্দোলন। এর নতুন নাম দেয়া হয়েছে 'গ্লোবাল স্যাটারডে'।

এই 'গ্লোবাল স্যাটারডে' আন্দোলনের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে দুর্বল অর্থনীতির দেশগুলোর চেয়ে বড় পুঁজিবাদী দেশগুলোতেই আগে শুরু হয়েছে ধনী হটানোর আন্দোলন। ফলে অস্থির হয়ে উঠেছে বিশ্বের পুঁজিবাজার। আন্দোলনকারীদের ক্ষোভ শেয়ারবাজারের বড় বড় স্টেকহোল্ডার আর ব্যাংকগুলোর ওপর। তারা কোনো আদর্শ বা দর্শনের কথা বলছে না বরং খুব সাদামাটাভাবে বলছে উন্নত বিশ্বে মাত্র ১ শতাংশ ধনী ৯৯ শতাংশ সাধারণ মানুষের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে। এই ৯৯ শতাংশের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে, এখন আমরা বুঝতে পেরেছি, ওদের জন্যই মন্দা লাগে আর তার ফল ওরা ভোগ করে না, ভোগ করে সাধারণ মানুষ- বেকারত্ব আর দারিদ্র্যে জর্জরিত হয় এরা, পক্ষান্তরে ধনীরা ক্রমাগত ধনী হয়।

অনুন্নত দেশগুলোর জন্য এ বিষয়টি নতুন না হলেও উন্নত দেশগুলোর এ সমস্যাটা ছিল অনেকটাই ছাই চাপা। বাংলাদেশে আমরা সমস্যাটার স্বরূপ কিছুটা অনুধাবন করতে পারি, কারণ এখানেও শেয়ারবাজার অস্থির, ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীরা হতাশ ও আস্থাহীন। বিনিয়োগে মন্দা কাটছে না, কৃষি উৎপাদন বাড়লেও মুদ্রা ব্যবস্থাপনার ব্যর্থতার জন্য সব ধরনের পণ্যের দামই বাড়ছে। এর সুফল ভোগ করছে ধনীরা আর কুফল ভোগ করছে গরিবেরা।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও সমস্যাটা একেবারে নতুন নয়, তবে ঠিক কোথা থেকে ধনীরা গরিবদের অর্থ-সম্পদ লুট করছে, সেটা বুঝতেই যা সময় লেগেছে। আগে অনেকেই মনে করতেন সাধারণ বাজারের ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন, বিপণন ও সরবরাহের প্রক্রিয়া থেকে ধনীরা মুনাফা বা অতিমুনাফা ওঠায়। কিন্তু বছর পনের ধরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও উন্নত দেশগুলোর অর্থনীতিবিদেরা আশঙ্কা প্রকাশ করছেন, ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের স্বার্থহানি করে এবং ব্যাংকিং ব্যবস্থা থেকে অতিমুনাফা অর্জন করছে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মালিকেরা। এসব বিষয়ের অনিয়মগুলোকে এরা আবার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মাধ্যমে বৈধ করে নিচ্ছে। এ ছাড়া বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ বিশ্বব্যাপী খবরদারির মাধ্যমে একই প্রক্রিয়া চালু রাখতে সাহায্য করছে।

অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি, ১৯৯৮ সালে এই বিষয়টিকে প্রথম পাদপ্রদীপের আলোয় আনেন আইসিটি জায়ান্ট মাইক্রোসফটের কর্ণধার বিল গেটস। সে সময় শেয়ারবাজারে ম্যানিপুলেশন বিভিন্ন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অবিমৃশ্যকারিতা এবং বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফের খবরদারি নিয়ে তিনি সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন। তার সাথে ছিলেন কয়েকজন আমেরিকান, ব্রিটিশ ও জার্মান অর্থনীতিবিদ। মার্কিন প্রশাসন তখন বিল গেটসকে শত্রুই প্রতিপন্ন করে বসেছিল। পরে অ্যান্টিট্রাস্ট মামলায় তাকে হয়রানি করাটাও ছিল অনেকটা ওই ঘটনারই ধারাবাহিকতা।

বিল গেটস মূলত ডিজিটাল ডিভাইড নিরসনে কাজ করতে বেশ কিছু অভিজ্ঞ সত্যের মুখোমুখি হন। তিনি দেখেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ডিজিটাল ডিভাইডের কারণ অনেকটাই আর্থিক বাণিজ্যের অনিয়ম থেকে উদ্ভূত আর বহির্বিশ্বের স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে বিশ্বব্যাংক আইএমএফ দারিদ্র্য নিয়ে ব্যবসায় করে বলেই দারিদ্র্য দূর হয় না। ফলে ডিজিটাল ডিভাইডের শাখা বেড়ে যায়। এসব উপলব্ধির ফলেই মেলিন্ডা-গেটস ফাউন্ডেশন জন্ম নেয় এবং শিশু চিকিৎসার ওষুধ উৎপাদনে অর্থায়ন শুরু করা হয়।

এবারের ওয়াল স্ট্রিটবিরোধী আন্দোলন শুরুর প্রেক্ষাপট অনেকটাই দীর্ঘমেয়াদি এক উপলব্ধির ফল, যা পরিপক্বতা পেয়েছে ভার্চুয়াল বিশ্বে বা সাইবার স্পেসে। এখানে বিভিন্ন সচেতন মহল ও ব্যক্তি একে অপরের সাথে মতবিনিময় করেছেন, উপলব্ধি করেছেন এবং পরস্পরকে সচেতন করেছেন। আমরা লক্ষ করেছি এ আন্দোলন শুরুর বেশ আগেই মার্কিন ধনী-গরিবের বৈষম্য কমানোর জন্য মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা ধনীদের ওপর বাড়তি ট্যাক্স বসানোর একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন। কাজেই এটা মনে করার কারণ নেই যে, আকস্মিক কোনো ইন্ধনে এই আন্দোলন শুরু হয়েছে। বরং বলা যায়, দীর্ঘদিন ধরে ধূমায়িত সমস্যা আরেকটি মন্দার মুখোমুখি এসে অগ্নি উদ্গিরণ করেছে।

এই যে উন্নত বিশ্বে ধনীদের আরও ধনী হয়ে ওঠার প্রক্রিয়া, এটা গুজব বা কানাঘুষা থেকে প্রকাশ্যে চলে আসে ২০০৯ সালে মন্দার শুরুতে। তখন অতিবিলাসী আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মালিক-কর্মকর্তাদের দুর্নীতির অনেক কেচ্ছা প্রকাশ হয়ে পড়ে। তবুও তাদেরকেই শুধু আউট করার জন্য শত শত বিলিয়ন ডলার বরাদ্দ করে মার্কিন সরকার। কিন্তু তার ফল হয়েছে উল্টো। ওই কোম্পানিগুলো বাঁচলেও তাদের সাথে সংশ্লিষ্ট ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীরা বাঁচেননি- তারা পুঁজি হারিয়েছেন। সহায়তা নেয়া কোম্পানিগুলো পরিকল্পনামাফিক নতুন কাজের সুযোগ সৃষ্টি করেনি। ফলে সাইবার স্পেসে চলা ক্ষোভকে নিউইয়র্কের রাস্তায় নামিয়ে আনেন শিক্ষিত তরুণ বেকার আর শিক্ষার্থীরা। অকুপাই ওয়াল স্ট্রিট নামের আন্দোলনে পরবর্তী সময়ে শামিল হয় অনেক মার্কিন পেশাজীবী সংগঠন। তারা সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয়- তারাই জনসাধারণের ৯৯ শতাংশ আর লুটেরা ধনীরা মাত্র ১ শতাংশ, ওদের হটাও। ইতালি, স্পেন, জার্মানি, ব্রিটেন এবং কানাডাতেও ▸

একই স্লোগান উঠছে।

ইতোমধ্যে সাইবার স্পেসে দেখা যাচ্ছে একটি বিশেষ ওয়েবসাইট 'ইউনাইটেড ফর গ্লোবাল চেঞ্জ'। এতে বলা হয়েছে বিশ্বের মানুষ জাগো, রাজনীতিবিদ এবং ব্যাংকার– যারা আমাদের স্বার্থ দেখে না, তাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার সময় এখন। লক্ষ্য পূরণ না হওয়া পর্যন্ত আমরা শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ করব, মানুষকে সংগঠিত করব। কিন্তু আন্দোলন আর শান্তিপূর্ণ থাকছে না। ইতালিতে সহিংসতা হয়েছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগোতেও সহিংসতা হয়েছে।

নিউইয়র্কসহ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনেক জায়গাতেই বিভিন্ন ব্যাংকের ভেতরে-বাইরে চলছে বিক্ষোভ। অনেকেই অ্যাকাউন্ট বন্ধ করতে আবেদন করেছেন। সিটি ব্যাংকের একটি শাখা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে অনির্দিষ্টকালের জন্য।

মার্কিন প্রশাসন শুধু নয়, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং উন্নত অন্য দেশগুলোর সরকার-অর্থনীতিবিদদেরও সমস্যার স্বরূপ বোঝার জন্য দফায় দফায় বৈঠক চলছে। বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফের অর্থনীতিবিদেরা বলছেন– এখনই উপযুক্ত ব্যবস্থা না নিলে এই আন্দোলন যেমন সঙ্কট সৃষ্টি করবে, তেমনি অর্থনৈতিক প্রবণতায় পরিবর্তন না আনলে আরও ভয়াবহ মন্দা সৃষ্টি হবে।

এ যেন কার্ল মার্কসের ক্যাপিটাল গ্রন্থে বর্ণিত পুঁজিবাদের সঙ্কট সংক্রান্ত বিষয়ের পুনরাবৃত্তি। এতে বলা হয়েছিল– 'লোভী পুঁজিপতি এবং অসৎ ব্যাংকাররা জনগণকে অধিকারহীন করবে। ফলে পুঁজিবাদ ক্রমশ মহাসঙ্কটের মুখোমুখি হবে। তারা যুদ্ধে লিপ্ত হবে এবং রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস দিয়ে বাড়তি উৎপাদনকে ধ্বংস করে মজুরি-দাসত্ব বজায় রাখতে চাইবে।' আবার লেনিন তার সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ স্তর গ্রন্থে লিখেছিলেন– 'আন্তর্জাতিক ব্যাংকগুলো একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন শক্তিতে পরিণত হবে এবং নিয়ন্ত্রণ করবে সমস্ত রাজনীতিকে।' এর একটি বর্ণকেও অসত্য বলা যাচ্ছে না আর। মার্কিন অর্থনীতিবিদেরাও এসব মন্তব্যকে প্রাসঙ্গিক মনে করছেন। মার্কিন মিডিয়াগুলো এখন গবেষণায় মেতেছে–একবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের প্রারম্ভে কী করে পুঁজিবাদের মধ্য থেকে উদ্ভব হলো এমন আন্দোলনের! অনেকে বলছেন আরব বিক্ষোভ যেভাবে আইসিটিকে নির্ভর করে সংগঠিত হয়েছিল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং উন্নত দেশগুলোতেও সেরকমই হয়েছে। তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যেকোনো 'আন্দোলন দমনের' ঐতিহ্য অন্যরকম; সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থেই গত শতাব্দীর ষাটের দশক থেকে নির্মমভাবে দমন করা হয়েছে সব ধরনের আন্দোলন; জনসন, নিক্সন, রিগ্যান, বুশ-১, ক্লিনটন, বুশ-২; কার আমলে না আন্দোলন দমন করা হয়েছে উন্মুক্ত হিংস্রতায়! তারও আগে ১৯৬০ সালের গোড়ার দিকে লিওনেস পাওলিংকে হত্যা করা হয়েছিল। কেন? স্নায়ুযুদ্ধের অবসান চেয়েছিলেন তিনি।

১৯৬৬ সালে হিপ্পিদের ওপরও নৃশংস আক্রমণ চালায় পুলিশ। এরপর থেকে 'কল্যাণের' নামে ক্রমশ সাম্রাজ্যবাদের সহযোগী পুঁজিবাদী শক্তিকে পৃষ্ঠপোষণ করে গেছে মার্কিন প্রশাসন, রিপাবলিকান ও ডেমোক্র্যাটপুষ্ট রাজনৈতিক পক্ষই। এরা প্রতিযোগিতা করে যাচ্ছে কিভাবে দুর্নীতিবাজ ব্যাংকার আর দুর্বৃত্ত স্টকব্রোকারদের স্বার্থ রক্ষা করা যায় সে জন্য। এজন্য বিদেশে যুদ্ধ বাধাতেও তারা দ্বিধা করছে না। মুক্তি আর গণতন্ত্রের ধুয়া তুলে ইসলামের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ, তাও তো ওই পুঁজিবাদের স্বার্থেই। এই প্রেক্ষাপটে খুব সঠিকভাবেই মার্কিন নতুন প্রজন্ম নিজেদের স্থাসাঙ্গ নির্ণয় করছে। বঞ্চনা-লাঞ্ছনা আর দারিদ্র্য-প্রপীড়িত ছেলেমেয়েরা নিজেদেরকে ৯৯ শতাংশ হিসেবে তুলে ধরে যে বিপ্লবের বার্তা ছড়াচ্ছে আইসিটির মাধ্যমে, তাতে যেমন সাড়া পড়েছে দেশে দেশে, তেমনি যে ১ শতাংশ উঠেছে শঙ্কিত হয়ে–তারাও খুঁজছে নানারকম ফন্দিফিকির।

ফিডব্যাক : *abir59@gmail.com*